চা জনগোষ্ঠীর কথা

মোহন রবিদাস

বাংলাদেশের চা জনগোষ্ঠী বহুকাল ধরে নিরক্ষরতা, নিপীড়ন, অত্যাচার, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বঞ্চনার মতো ভয়াবহ অমানবিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করে আসছেন। তাঁরা চা বাগানের লেবার লাইনে এমনভাবে বসবাস করেন যেন মূল বাংলাদেশ এবং বাঙালি জনগোষ্ঠী থেকে তাঁরা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন একটি দ্বীপের বাসিন্দা। দেশের প্রচলিত উন্নয়ন ধাক্কায় তাঁদের অবস্থার উন্নতির বদলে দেখা দিচ্ছে আরও বিপদের লক্ষণ। চুনারুঘাটে চা শ্রমিকদের আবাদী জমি দখল করে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠন তার একটি। বর্তমান প্রবন্ধে চা শ্রমিকদের বর্তমান অবস্থার পাশাপাশি নতুন বিপদ ও তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের কথা আলোচিত হয়েছে।

শিক্ষাহীন এই চা জনগোষ্ঠী চা বাগানের বাইরের দুনিয়া সম্পর্কে ভীত। তাই তারা নিজেদের অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তোলে না, হয় না উচ্চকণ্ঠ। সে কারণে তারা রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, খালি পায়ে, বিষাক্ত পোকা-মাকড়ের কামড় খেয়ে মাত্র ৮৫ টাকার (কয়েক দিন আগেও ছিল ৭৯ টাকা) বিনিময়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করে। এই টাকা দিয়ে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা তো দূরের কথা, টিকে থাকাই একটা বড় চ্যালেঞ্জ। তাই মা-বাবার সাথে ছেলেমেয়েদেরও চা বাগানেই কাজ করতে হয়। যে কারণে সামান্য প্রাথমিক শিক্ষাও তাদের ভাগ্যে জোটে না। আর উচ্চশিক্ষা তো কল্পনাতীত।

মানুষের সম্মান ও অধিকার নিশ্চিত করে এমন অনেক সাংবিধানিক রক্ষাকবচ ও আইন এদেশে রয়েছে। যেমন– বাংলাদেশের সংবিধানের ২৭ নং ধারায় বলা হয়েছে, "সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান ও আইনের সমান আশ্রয়লাভের অধিকারী।" একইভাবে ২৮(১) ধারায় বলা হয়েছে, "কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না।"। আবার 'সার্ক সামাজিক সনদ', বাংলাদেশের বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের 'নির্বাচনী ইশতেহার' ইত্যাদিতে চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নত করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়েছে। কিন্তু এসব প্রতিশ্রুতির যথাযথ বাস্তবায়ন হয়নি । চা শ্রমিকদের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ না দেওয়ার কারণে একদিকে যেমন চা শ্রমিকদের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য আজ বিলীন হওয়ার পথে, অন্যদিকে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার চা শিল্প।

ওপরে প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী চা শ্রমিকরা বাংলাদেশের প্রকৃত আদিবাসী। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার এদের আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃত তো দেয়ইনি, এমনকি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর তালিকায়ও এদের অন্তর্ভুক্ত করেনি; যে কারণে এরা কোটা সুবিধা থেকে বঞ্চিত

চা শ্রমিকদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়

বেনিয়া ইংরেজ অতি কূটকৌশলের মাধ্যমে কম দামে শ্রম কিনে যাতে অধিক মুনাফা অর্জন করা যায় সেই লক্ষ্যে আজীবন কাজের শর্তে চুক্তিবদ্ধ করে ভারতের বিহার, মাদ্রাজ, উত্তর প্রদেশ, ওড়িশা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে কানু, তেলেগু, লোহার, রবিদাস, গোয়ালাসহ প্রায় ১১৬টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে শ্রমিক হিসেবে সংগ্রহ করে।

নৃতাত্ত্বিক সংজ্ঞানুসারে চা শ্রমিকদের কেউ প্রাক-দ্রাবিড়ীয়, কেউ আদি অস্ট্রালয়েড, কেউ বা মঙ্গোলীয় আদিবাসীর অন্তর্ভুক্ত, যাদের প্রত্যেকের ভাষা, সংস্কৃতি, আচার-আচরণ, ধর্মীয় রীতিনীতি, পূজা-উৎসব, বিবাহপ্রথা, সমাজ-কাঠামো দেশের মূলধারার জনগোষ্ঠী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। অন্যদিকে বিশ্বব্যাংক, জাতিসংঘ, আইএলওর সংজ্ঞানুসারে আদিবাসী হলো তারাই–

* যাদের ভাষা, সংস্কৃতি, আচার-আচরণ, সমাজ-কাঠামো ইত্যাদি দেশের মূলধারার জনগোষ্ঠী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক;
* যারা প্রান্তিক এবং ঔপনিবেশিক কাল ও আধুনিক বা জাতিরাষ্ট্র গঠনের সময় থেকে শোষণ ও বঞ্চনার শিকার;
* যাদের ভূমির সাথে বিশেষভাবে আত্মিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক রয়েছে;
* দেশ পরিচালনায় যাদের কোনো প্রতিনিধি নেই।

ওপরে প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী চা শ্রমিকরা বাংলাদেশের প্রকৃত আদিবাসী। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার এদের আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃত তো দেয়ইনি, এমনকি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর তালিকায়ও এদের অন্তর্ভুক্ত করেনি; যে কারণে এরা কোটা সুবিধা থেকে বঞ্চিত। অন্তর্ভুক্ত করলে এরা দেশের সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও চাকরিক্ষেত্রে নিজেদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে পারত এবং নিজেদের দুরবস্থার পরিবর্তনের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারত।

চা জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক হয়েও চা জনগোষ্ঠীর প্রতি সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবজ্ঞা আর বঞ্চনা জনসমাজে যেন 'স্বাভাবিক' ও 'স্বতঃস্ফূর্ত' ব্যাপার। ব্যবস্থাগত সামাজিক আচরণের ভেতর দিয়ে 'মূলধারার সমাজে' চা জনগোষ্ঠী ক্রমশ 'অপর' হয়ে পড়ছে। অন্যদিকে শোষণ আর নিপীড়নে ব্রিটিশ বেনিয়াদের উত্তরসূরিরা চা শ্রমিকদের আগের মতোই ঔপনিবেশিক ধারায় শোষণ করে চলেছে। তাদের জীবনধারায় শোষক কর্তৃক শোষণের পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটেনি। আর এ কারণেই চা জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক তথা জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হয়নি; বরং হওয়ার সম্ভাবনাও সাদা কাপড়ে ঢাকা পড়ে গেছে। আমাদের দেশের সীমিত মজুরি, নামকাওয়াস্তে রেশনসামগ্রী দিয়েই যুগের পর যুগ তাদের রাখা হচ্ছে অন্ধকারে। সেজন্যই হয়তো বা অনেকে তাদের অন্ধকার জগতের মানুষ হিসেবে অভিহিত করে থাকে।

আগেই বলা হয়েছে, সুবিধাবঞ্চিত এই চা জনগোষ্ঠীকে শুধু সমানাধিকার দেওয়াই যথেষ্ট নয়, এরা রাষ্ট্রের বিশেষ মনোযোগ পাওয়ার যোগ্য। অথচ দুর্ভাগ্যজনকভাবে এরা আগের মতোই সমাজ

থেকে বিচ্ছিন্ন কম মজুরিপ্রাপ্ত, নিরক্ষর ও বঞ্চিত। তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, শিক্ষা, জ্ঞান ইত্যাদি হারিয়ে ফেলেছে। চা বাগানের লেবার লাইনে তারা এমনভাবে আবদ্ধ, যেন মূল বাংলাদেশ ও বাঙালি জনগোষ্ঠী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন একটি দ্বীপের বাসিন্দা। তারা হারিয়ে ফেলেছে তাদের মর্যাদা। এ অবস্থা চা শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের শোষণ করার মোক্ষম সুযোগ করে দিয়েছে; অধিকাংশ চা শ্রমিক আজ নাগরিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে যাপন করছে অমানবিক জীবন, যা নিচের কয়েকটি বিষয় পর্যালোচনা করলে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যাবে–

শিক্ষা

বাংলাদেশে শিক্ষার হার সবচেয়ে কম এদেশের চা বাগানগুলোতে। দেশে বাজেটের একটা বিরাট অংশ যেখানে ব্যয় হচ্ছে শিক্ষা খাতে, সেখানে চা বাগানের শিক্ষার হার অতি নগণ্য। চা বাগানে ৬ থেকে ১১ বছরের শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব কোম্পানির বা বাগান মালিকের থাকলেও বাস্তবে তা করা হচ্ছে না। পারিবারিক অভাব ও বিবিধ কারণে অনেক অভিভাবক তাদের সন্তানকে বিদ্যালয়ে না পাঠিয়ে গৃহপালিত পশুর খাবার, ছোট ভাইবোনদের দেখাশোনা, রান্নার কাজ, বাগানের কাজসহ অন্যান্য কাজে নিয়োগ করে। ফলে শিশুকাল থেকেই শ্রমিক সন্তানরা শিক্ষাবিমুখ হয়ে পড়ে। তাছাড়া শ্রমিক মা-বাবার লক্ষ্য থাকে ভবিষ্যতে তার সন্তানকে বাগানের কাজে তালিম দেওয়া এবং বাগানের শ্রমিক হিসেবে তালিকাভুক্ত করা। কোনো কোনো বাগানে শিক্ষক থাকলেও বিদ্যালয় নেই, আবার বিদ্যালয় থাকলেও হয়তো বা শিক্ষক নেই। কোনো কোনো বাগানে কেরানি সাহেবকে দিয়ে বিদ্যালয়ের কাজ চালানো হচ্ছে। চা বাগানগুলোতে অতীতের তুলনায় শিক্ষার হার কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও শিক্ষার মান মোটেই ভালো নয়। নগণ্য।

চা বাগানগুলোতে কলেজ, উচ্চ বিদ্যালয় তো নেই-ই, এমনকি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যাও হাতে গোনা। ভাষাগত সমস্যার কারণে চা শ্রমিক সন্তানরা বাঙালি অধ্যুষিত স্কুল-কলেজে পড়তে গিয়ে ঠাট্টা-মশকরা আর বৈষম্যের শিকার হয় বলে এদের অধিকাংশই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করার আগেই ঝরে পড়ে।

> চা গাছকে ঘিরে গভীর জঙ্গল বা আগাছা থাকে, তাই সেখানে বিষাক্ত পোকা-মাকড়, সাপ, বিচ্ছু, গজর (শুঁয়োপোকা), হাঁড়ি বরল (এক ধরনের বিষাক্ত মাছি, যা চা গাছের ডালে মাটির হাঁড়ি বানিয়ে বাস করে), বিষাক্ত পিঁপড়া ইত্যাদির অবাধ বিচরণ।

দারিদ্র্যের যাঁতাকলে পিষ্ট এই চা জনগোষ্ঠীর ছেলেমেয়েরা যেখানে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করতে বাধাগ্রস্ত হয়, সেখানে তাদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের আকাঙ্ক্ষাকে অনেকে বাস্তব জ্ঞান করতে চান না; এমনকি বিদ্রূপও করেন। এত প্রতিকূলতা মোকাবিলা করেও কিছু স্বপ্নবান চা শ্রমিক সন্তান মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালোভাবেই উত্তীর্ণ হয়েছে, যা হয়তো প্রচলিত অর্থে মেধা যাচাইয়ের মানদণ্ডে উপযুক্ত নয়। তথাপি ৮/১২ ফুট মাপের ছোট্ট একটি ঘরে তিন প্রজন্মের অন্তত ১২-১৩ জন মানুষ যেখানে গাদাগাদি করে বাস করে, সেখানে পড়ালেখা করে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখার স্বপ্ন দেখছে, তাদের কি মেধাবী বলা যায় না?

এই স্বপ্নবান চা জনগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষার জন্য বরাদ্দকৃত কোনো ধরনের বিশেষ ব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। আর এর কারণ লুকিয়ে আছে সামাজিক মূল্যবোধ, সামাজিক চর্চা আর নীতিনির্ধারণী মহলের এই জনগোষ্ঠীর প্রতি অমনোযোগিতার মধ্যে। এ অবস্থায় উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে চা জনগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদান করা এখন সময়ের দাবি।

চা বাগান এলাকায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ধরন ও ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হলো–

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ধরন	ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা
বাগান পরিচালিত	১১,৫৩৫
সরকারি ব্যবস্থাপনা	৬,৮৮২
এনজিও	১২,৮৩৮
অন্যান্য	৩,৩৫৩
মোট	৩৪,৭৮৯

সূত্র : বিগত ১০.০৫.২০১০ ইং তারিখে বিটিআরআই সেমিনার কক্ষে বিসিএস নেতৃবৃন্দের পেশকৃত প্রতিবেদন।

ওপরের ছক থেকে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, সাত লক্ষাধিক চা জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার সুবিধা পাওয়া প্রজন্মের সংখ্যা মাত্র ৩৪,৭৮৯ জন, যাদের পূর্ববর্তী প্রজন্ম এখনও নিরক্ষরই রয়ে গেল।

চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা

চা বাগানগুলোতে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবার মানের অবস্থা খুবই নাজুক। কারণ এখানে স্বাস্থ্যসেবার নামে চলে রসিকতা। অধিকাংশ চা বাগানে হাসপাতাল নেই, আবার হাসপাতাল থাকলেও ডাক্তার নেই, ওষুধ নেই, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জাম নেই। এই নেই নেই এর মধ্যে চলছে বাগানগুলোর স্বাস্থ্যসেবা। অভিজ্ঞ বা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রী না থাকায় চা বাগানগুলোতে মাতৃমৃত্যুর হার দিন দিন বেড়েই চলেছে। ১৯৬২ সালের টি প্লান্টেশন লেবার অর্ডিন্যান্স এবং ১৯৭৭ সালের প্লান্টেশন রুলসে চা বাগানগুলোতে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা মালিকের দায়িত্ব থাকলেও তা করা হচ্ছে না। যক্ষ্মা, টাইফয়েড, রক্তশূন্যতা, ডায়রিয়া ইত্যাদি চা শ্রমিকদের নিত্যদিনের সঙ্গী।

আবাসন ব্যবস্থা

চা শ্রমিকরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম চা বাগানে বসবাস করলেও তারা তাদের বসতভিটার মালিকানা পায়নি। তারা যেন নিজভূমে পরবাসী। চা বাগানে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি আবাসন ও পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার দায়িত্ব বাগান মালিকের থাকলেও এটি নিয়ে কারো মাথাব্যথা নেই। ৮/১২ ফুট মাপের একটি ঘরে চা শ্রমিকদের অন্তত তিনটি প্রজন্ম বাস করে। এটি যেমন অস্বাস্থ্যকর, তেমনি মানহানিকর ওই ঘরের সবার জন্য, সমাজের জন্য তো বটেই। এতে বাগানের শিশুদের আত্মসম্মান ও মানসিক বিকাশও ঠিকমতো হয় না।

শ্রমজীবী নারী চা শ্রমিক

এ দেশের অন্যান্য শ্রমজীবী নারীর তুলনায় চা বাগানের নারী চা শ্রমিকদের জীবনধারা ও কাজের ধরন সম্পূর্ণ আলাদা। চৌকিদারের ডাকে খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে সাংসারিক সব কাজকর্ম করে সকাল ৮টার মধ্যে কাজে বেরিয়ে পড়তে হয়। স্থানভেদে চার-পাঁচ মাইল পথ হেঁটে তারপর কর্মস্থলে পৌঁছতে হয়। সাধারণত চা পাতা তোলা ও চা গাছ ছাঁটাই করা–দুটি কাজই নারী চা শ্রমিকরা করে থাকে, যা

খুবই কষ্টকর ও ঝুঁকিপূর্ণ; বিশেষ করে বর্ষাকালে তাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হয়। কেননা উঁচু উঁচু টিলা (ছোট পাহাড়) বেয়ে তাদের চা পাতা সংগ্রহ করতে হয়। এছাড়া যেহেতু চা গাছকে ঘিরে গভীর জঙ্গল বা আগাছা থাকে, তাই সেখানে বিষাক্ত পোকা-মাকড়, সাপ, বিচ্ছু, গজর (শুঁয়োপোকা), হাঁড়ি বরল (এক ধরনের বিষাক্ত মাছি, যা চা গাছের ডালে মাটির হাঁড়ি বানিয়ে বাস করে), বিষাক্ত পিঁপড়া ইত্যাদির অবাধ বিচরণ। যদিও কামড় খেতে খেতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে বলে তারা এগুলোকে বিষাক্ত মনে করে না। যা হোক, মাত্র ৮৫ টাকার বিনিময়ে সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত তাদের কাজ করতে হয়। এর মধ্যে তারা দুপুর ২টায় আধাঘণ্টা সময় পায় দুপুরের খাবারের জন্য। তখন বাড়ি থেকে আনা রুটি এবং তার সাথে মরিচ, পেঁয়াজ, আলু ও কচি চা পাতা মিশিয়ে বিশেষ এক ধরনের চাটনি তৈরি করে দুপুরের খাবার সেরে ফেলে। কেউ বা চাল ভাজা ও লাল চা দিয়েই সাঙ্গ করে দুপুরের খাবার। তারপর আবার কাজ শুরু, যা চলতে থাকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত। এরপর আবার বাড়ির কাজ এবং পরদিন খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠা... ...এভাবেই শতকষ্টের মধ্যে কেটে যাচ্ছে তাদের জীবন। এদেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে এই নারীরা এক বিরাট ভূমিকা পালন করছে, কিন্তু এদের ভাগ্যের উন্নতির জন্য সরকারপক্ষ থেকে কোনো ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না।

চা শ্রমিকদের আয়-ব্যয়ের কথা

চা শ্রমিকরা রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, খালি পায়ে, জোঁক, মশা, সাপসহ বিষাক্ত পোকা-মাকড়ের কামড় খেয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করে মাত্র ৮৫ টাকা মজুরি পায়। মাত্র কিছুদিন আগেও তারা ৭৯ টাকা মজুরি পেত। আয়ের সাথে এদেশের চা শ্রমিকদের ব্যয়ের কোনো মিল নেই। দেশে দ্রব্যমূল্য যে হারে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেই হারে চা শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি পাচ্ছে না। এতে তাদের জীবন আরো দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে।

চা শ্রমিকদের ভূমি সমস্যা এবং চান্দপুর-বেগমখানের জমিতে স্পেশাল ইকোনমিক জোন স্থাপন

বাংলাদেশের ১৫ লাখ চা শ্রমিক ১৮০ বছর ধরে বাংলাদেশে বসবাস করলেও এখন পর্যন্ত ভূমির অধিকার পায়নি। বলা যায়, তারা নিজভূমে পরবাসী। চা শ্রমিকরা অত্যন্ত অল্প মজুরিতে কাজ করে, যা দিয়ে তাদের সংসার চলে না। তাই ধান ও শাকসবজির চাষাবাদ তাদের বাড়তি রোজগার। কিন্তু জমির কাগজপত্র বা রেজিস্ট্রেশন না থাকার কারণে এই কৃষিজমিগুলো দেশের প্রভাবশালীদের দখলে চলে যাচ্ছে। চা বাগানগুলোতে জমি দখলের ঘটনা প্রতিনিয়তই ঘটছে। সম্প্রতি হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলার চান্দপুর-বেগমখান চা বাগানের ১,২৫০টি চা শ্রমিক পরিবারের ৫১১.৮৩ একর কৃষিজমিতে স্পেশাল ইকোনমিক জোন স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ ব্যাপারে চা শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ বা পুনর্বাসন তো দূরের কথা, তাদের মতামত নেওয়ারও দরকার মনে করেনি বেজা। যে কারণে চান্দপুর-বেগমখান চা বাগানের শ্রমিকরা স্পেশাল ইকোনমিক জোন স্থাপনের প্রতিবাদে আন্দোলন-সংগ্রাম করে চলেছে।

চান্দপুর-বেগমখান চা বাগানের যে ৫১১.৮৩ একর কৃষিজমিকে চুনারুঘাট উপজেলার ভূমি অফিসের দখলনামায় অকৃষি, খাস ও পতিত জমি হিসেবে দেখানো হয়েছে, সেই জমিতে বছরে ৪.৫ কোটি টাকা মূল্যমানের ধান এবং প্রায় দেড় কোটি টাকা মূল্যমানের অন্যান্য ফসল উৎপাদিত হয়। তাই এই বিপুল পরিমাণ আবাদি জমি ধ্বংস করে এখানে ইকোনমিক জোন করা হলে তা কেবল কিছু ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করবে; সাধারণ চা শ্রমিকরা এর সুফল ভোগ করা থেকে বঞ্চিতই থেকে যাবে।

এছাড়া চা বাগানের অনেক জমিজমা দখল করে রশিদপুরে গ্যাসক্ষেত্র স্থাপন, লাক্কাতুরায় স্টেডিয়াম নির্মাণসহ সরকারি-বেসরকারি বহু শিল্প-কারখানা স্থাপন করা হয়েছে। এসব শিল্প-কারখানা স্থাপনের পূর্বে চা শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তা পরবর্তী সময়ে পাওয়া যায়নি। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে আশ্বাস দিলেও পরে একটা পিয়নের চাকরিও চা শ্রমিকরা পায়নি। চুনারুঘাটের পাশের উপজেলা মাধবপুরে সাম্প্রতিককালে গড়ে ওঠা কল-কারখানাগুলোতে স্থানীয় জনগণের চাকরি হয়েছে খুব সামান্যই; কিন্তু কারখানার বিষাক্ত বর্জ্যের কারণে গাছপালা, পশুপাখি, পুকুরের মাছ ধ্বংস হয়ে গেছে। চর্মরোগসহ বিভিন্ন দুরারোগ্য ব্যাধিতে মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে।

চা বাগানের অনেক জমিজমা দখল করে রশিদপুরে গ্যাসক্ষেত্র স্থাপন, লাক্কাতুরায় স্টেডিয়াম নির্মাণসহ সরকারি-বেসরকারি বহু শিল্প-কারখানা স্থাপন করা হয়েছে। এসব শিল্প-কারখানা স্থাপনের পূর্বে চা শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তা পরবর্তী সময়ে পাওয়া যায়নি। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে আশ্বাস দিলেও পরে একটা পিয়নের চাকরিও চা শ্রমিকরা পায়নি।

চান্দপুর-বেগমখান চা বাগানে স্পেশাল ইকোনমিক জোন হলে সেখানে যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে না তা চা শ্রমিকরা ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছে। বরং ইকোনমিক জোন স্থাপন করা হলে ক্ষতির সম্মুখীন হবে ওই এলাকায় চা শিল্প, কৃষিসমাজ। তাছাড়া সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান, রঘুনন্দন অরণ্য, রেমা-কালেঙ্গা অভয়ারণ্যও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারখানার বর্জ্য সুতাং নদী দিয়ে নিষ্কাষিত হবে, এই এলাকার পুকুর-নালা, হাওর-বাঁওড় দূষণের শিকার হবে, ধ্বংস হবে মৎস্যভাণ্ডার।

তাই চান্দপুর-বেগমখান চা বাগানের কৃষিজমিতে স্পেশাল ইকোনমিক জোন স্থাপনের প্রতিবাদে আজ দেশের ২৪৯টি চা বাগানের ১৫ লাখ চা জনগোষ্ঠী আন্দোলনে নেমেছে। তারা স্লোগান দিচ্ছে–রক্ত দেব, জীবন দেব; কৃষিজমি দেব না। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে চা জনগোষ্ঠীর দীর্ঘদিনের ভূমি অধিকারের প্রশ্নটিও সামনে উঠে এসেছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে চা জনগোষ্ঠীকে ভূমির স্বীকৃতি দেওয়া তাই এখন সময়ের দাবি।

মোহন রবিদাস: চা শ্রমিক সংগঠক
ইমেইল: robidasmohan@gmail.com